নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃঃ ৪৫-৬০
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শাহীনা পারভীন*

উপনিবেশবাদ ও সামাজিক রূপান্তর: ড্যাং অরণ্যবাসী

বিশ্বব্যবস্থার বিবিধ ধরন বুঝতে উপনিবেশবাদ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ জ্ঞানজগতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ ক্ষমতার সম্পর্ক উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও উপনিবেশবাদের মাধ্যমে উপনিবেশিত রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্তন বোঝাবুঝি অনেক নৃবিজ্ঞানীর কাজে বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে। তাদের অনেকের দৃষ্টিতে, সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্প্রসারণে উপনিবেশবাদ মূল হিসেবে কাজ করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তনে নানাবিধ পথে এগোয়। উপনিবেশিত সমাজ সম্পর্কে টেক্সট উৎপাদনের মাধ্যমে সেই সমাজকে পরিবেশন করা ও প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি পরিবর্তন করা হয়। উপনিবেশিক শক্তি 'লিবারেল গণতান্ত্রিক রাজনীতির' মূলনীতি, 'ভালো মানবিক সরকারের' মূলনীতি, 'উন্নত' জীবন, 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা', 'সুস্বাস্থ্য' জীবন এই ধরনের মূলনীতি সূচনা করার মধ্য দিয়ে মতাদর্শিক পরিবর্তন আনয়ন করে। যার মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের পূর্বতন মূলনীতি rule of force, rule of law তে পরিবর্তিত হয়। উপনিবেশিক শক্তি এইক্ষেত্রে উপনিবেশিত সমাজে ভালো সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করলেও কোনভাবেই উপনিবেশিত ও উপনিবেশিক সমাজের মাঝে সমতা আনয়নের কথা বলে না। কারণ, উপনিবেশিক ক্ষমতা rules of difference নিয়ে এগোয়। ফলে উপনিবেশবাদ ক্ষমতার চর্চা হিসেবে উপনিবেশিতকে অন্তর্ভুক্ত করে বা বাদ দেয়। তাদের কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা নিয়ে এমন জ্ঞান তৈরি করা হয় ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে এমন কার্য হিসেবে গঠিত, বৈশিষ্টায়িত এবং নকশাকৃত করা হয়, যার মধ্য দিয়ে এই শাসনের প্রভাব উৎপাদিত হতে থাকে (Scott 2005)। এর মাধ্যমে প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। প্রাক - পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতি পলিসি সকল কিছুই পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনসমূহ প্রাধান্যশীল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্থান করে নেয়। এর মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভবনাসমূহ তৈরি হয় একই সাথে পুরাতন ব্যবস্থাসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরিবর্তিত যে পরিস্থিতি সেখানে শুধুমাত্র নতুন (আধুনিক) পছন্দসমূহই তৈরি হতে পারে। এর কারণ হলো, পরিবর্তনসমূহ সাবজেক্টিভিটি ও সামাজিক স্পেসকে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যস্ত করে। এটি

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: shahinamoni@yahoo.com

সাবজেক্টের উপর ক্রিয়া করে, একইভাবে সাবজেক্টের মাঝে ক্রিয়া করে (Asad 1990)। এই প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়ে একটি জনপদের সামাজিক রূপান্তর ঘটে।

এই লেখাটির উদ্দেশ্য মূলত উপনিবেশিক শক্তি কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিত সমাজে প্রবেশ করে, উপনিবেশিত সমাজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ও সেই সমাজের রূপান্তর ঘটায় তা নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খতিয়ে দেখা। পাশাপাশি এই রূপান্তরণ প্রক্রিয়ার উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা, প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা কী থাকে তাও বোঝার চেষ্টা করা করা। লেখাটি ভূমিকা ও উপসংহার বাদে মূলত দুটো অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ উপনিবেশবাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন, তারা উপনিবেশিত সমাজে প্রবেশে ঔপনিবেশিক শক্তির কী কী পন্থা উল্লেখ করেছেন, সমাজকে রূপান্তরেঔপনিবেশিক শক্তির কী কী কৌশল থাকে, এতে উপনিবেশিতদের সক্রিয়তা ও অভিজ্ঞতা কী থাকে, সে নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর লেখার দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদ ডেভিড হার্ডিম্যানের একটি প্রবন্ধ "Power in the Forests: The Dangs, 1820-1940" পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক শক্তি একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীতে কীভাবে অনুপ্রবেশ করে ও যে বিবিধ উপায়ে তার শাসন ব্যবস্থা জারি রাখার মাধ্যমে উপনিবেশিত মানুষের জীবনে রূপান্তর ঘটায়, তা তুলে ধরা হয়েছে।

উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ

একটি সমাজ যখন অপর সমাজে তার দমন, পীড়ন শাসন ও শোষণ ব্যাবস্থাদি বলপূর্বক বা সম্মতি আদায় বা উভয় কৌশলে জারি রাখে এই প্রক্রিয়াকে আমরা উপনিবেশবাদ হিসেবে বুঝি। পূর্বে উপনিবেশবাদকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর অনাহূত প্রবেশ ও তাদের সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সাথে যুক্ত করে দেখা হতো। বিংশ শতকের মাঝামাঝি হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে বলা হলেও পরবর্তীতে পরোক্ষভাবে সর্বত্র উপনিবেশবাদ স্থাপন বহাল রয়েছে যা নয়া উপনিবেশবাদ হিসেবে বিশ্লেষিত হয় (Thomas 1996:1)। উপনিবেশবাদের ফলে উপনিবেশিত সমাজে কীরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, তাদের অভিজ্ঞতা কী থাকে, উপনিবেশবাদকে কীভাবে বোঝা যেতে পারে, এ সংক্রান্ত আলোচনায় নিকোলাস থমাসের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার *Colonialism's culture* বইটিতে উপনিবেশবাদ নিয়ে বিবিধ লেখালেখি পরীক্ষণ করার মাধ্যমে উপনিবেশবাদকে সাম্রাজ্যবাদ, অন্যকরণ, ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও প্রাচ্যবাদের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, উপনিবেশবাদকে শুধুমাত্র উপনিবেশকারি ও উপনিবেশিতদের মাঝে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্পর্ক হিসেবে বোঝা যাবে না, এটি কীভাবে প্রগতি বা বর্ণবাদ ধারণার মাঝে যৌক্তিক হয়, তা দিয়েও নয়, উপনিবেশবাদকে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে বোঝা জরুরি। তবে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাদেখির মাঝে সীমাবদ্ধ থেকেও উপনিবেশবাদকে বোঝা সম্ভব না। উপনিবেশবাদ বুঝতে তিনি ডিসকোর্স প্রত্যয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কারণ ডিসকোর্স বিশ্লেষণের

মাধ্যমে উপনিবেশিত সমাজ নিয়ে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়ান তৈরি করা হয় তা বোঝা সম্ভব হয়।

তিনি বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ নিয়ে লেখালেখিতে উপনিবেশিত সমাজের জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে ঢালাওভাবে উপস্থাপন করা হয়। তাদের সকলের অভিজ্ঞতা থাকে একইরকম। আবার মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করা হয় উপনিবেশবাদকে। উপনিবেশিত জনগণকে উপস্থাপন করা হয় খুবই নিক্রিয়ভাবে, যারা কিনা নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে কখনোই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। উপনিবেশবাদ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাই থমাস স্ট্রলারের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। উপনিবেশবাদকে যেভাবে পাঠ করা হয়, সে প্রসঙ্গে স্ট্রলারের তিনটি আপত্তিকে থমাস আলোচনায় এনেছেন। প্রথমত উপনিবেশবাদকে বোঝার ক্ষেত্রে বর্ণবাদ দিয়ে বোঝার যে প্রবণতা সে প্রসঙ্গে স্ট্রলারের আপত্তি রয়েছে। এখানে বর্ণবাদকে শুধুমাত্র নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠ করা সমস্যাজনক। তার দ্বিতীয় আপত্তি হলো, উপনিবেশবাদকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে, এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী উন্মুলিত হয়, উপনিবেশবাদের প্রভাব মারাত্মক, এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী অধীনস্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়। স্ট্রলার যুক্তি দেন, এটি অস্বীকার করা যায় না যে, ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন প্রণালী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মুছে দেয়। যেমনঃ উপনিবেশবাদের মাধ্যমে পশুপালনের মতো অর্থনৈতিক কর্মসূচি দ্বারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তিত হয়। তবে এই পরিবর্তনকে উপনিবেশবাদের মারাত্মক প্রভাব বা ফলাফল বলাবলির যে প্রবণতা তা উপনিবেশিত সমাজে আদৌ কী ঘটছে, সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জনকে ব্যাহত করে। স্ট্রলার এই ধরণের প্রবণতাকে রোমান্টিক বয়ান হিসেবে দেখেন। যা কিনা স্থানীয় প্রতিরোধের ইতিহাসকে উধাও করে দেয়। অনেক কেসেই যেটাকে ঔপনিবেশিক আধিপত্য, খ্রীস্টিয়ানিটির আরোপন, বিজয়ের ফ্যান্টাসি হিসেবে অনুধাবন করা হয়।

তিনি বলেন, এভাবে উপনিবেশবাদকে সম্পূর্ণভাবে আধিপত্যের সাথে যুক্ত করা মূলত বিভ্রান্তিকর। কারণ, শাসক গোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে শাসনের নিয়ন্ত্রক এভাবে কল্পনা করা ভুল। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীও যখন উপনিবেশিত সমাজে যায় তারা সবসময় একধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা তারা কখনোই সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না। তাই উপনিবেশকারীর টেক্সটে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বময় আচরণ প্রতিফলিত হয়। উপনিবেশিতদের শাসন ও পুনর্বিন্যাসে উপনিবেশকারীর ব্যঞ্জনাময় চরিত্র ফুটে উঠে। তাই স্ট্রলার এই পর্যায়ে যুক্তি দেন, উপনিবেশবাদ কিছু অংশে সফল বা ব্যর্থ হবার ইতিহাসের সাথে যুক্ত নয়। এর সাথে বিনিময়ের জিজ্ঞাসা যুক্ত। স্ট্রলারের তৃতীয় আপত্তি হলো, উপনিবেশিক সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র উপনিবেশিতদের আনুষ্ঠানিকভাবে শাসন করার অফিসিয়াল রিপোর্ট দিয়ে বোঝাবুঝি নিয়ে। তিনি এর বিপরীতে বিবিধভাবে উপনিবেশিতদের সম্পর্কে জ্ঞান নির্মাণের বিষয়টি বোঝার উপর জোর দেন। যেমন ভ্রমণকাহিনী, মিশনারি রিপোর্ট, এথনোগ্রাফি , উপন্যাস, ছবি, সিনেমার মাধ্যমে বিবিধভাবে জ্ঞান নির্মাণ করা হয়। আবার এই সকল

পরিবেশনা যে নেতিবাচক তা-ও না। তাই উপনিবেশিতদের নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে একক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব না। এটি একটি জটিল সম্পর্ক (Thomas 1996: 14-17)।

ডেভিট স্কট তার *Colonial Governmentality* নামক লেখায় উপনিবেশিত সমাজে উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের দিকসমূহ উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য ফুকোর জ্ঞান/ক্ষমতা ফরমুলেশন বোঝা জরুরি। কারণ এর মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক প্রজেক্ট রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ পায়। উপনিবেশকারী যখন উপনিবেশিত জনগণ সম্পর্কে বলে, এই বলাবলির মাঝে সবসময়ই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উপনিবেশিতদের অধঃস্তন অবস্থান প্রমাণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের পরিবেশনা ও বলাবলির মাধ্যমে ও পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত সমাজের পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের মাঝেই সাবজেক্ট ক্রিয়া করে (Scott 2005)। হার্টসক বলেন, প্রান্তিক বা অন্যকে নির্মাণ একটি ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যাপার। যৌক্তিক সাবজেক্ট সর্ম্পকে জ্ঞান তৈরি করার জন্য অন্য একটি সত্তা নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়। তাই অন্য এর বিপরীতে এমন একটি যৌক্তিক সাবজেক্ট তৈরি করা যে কিনা আলোকোদয় দর্শন সম্পর্কে বলে। সিমন দ্যা বুভেয়া নারীকে অন্য হিসেবে নির্মাণের পেছনের ক্ষমতা ব্যবস্থাকে উন্মোচন করেন যা কিনা এই অন্য, উপনিবেশিত জনমানুষের প্রেক্ষিত বুঝতে সহায়ক। হার্টসক তাই ব্যুভোয়াকে উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, ভালোর জন্য মন্দ, আলোকে গুরুত্বহ করতে প্রয়োজন অন্ধকারের। তেমনি উপনিবেশিক শক্তির মহিমা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপনিবেশিতের (Hartsock 1990: 160)।

আলবার্ট মেমমি তার *The Colonizer and the Colonized* বলেন, উপনিবেশিতদের এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় বা অন্য হিসেবে এমন গুণাবলির মাধ্যমে নির্মাণ করা হয় যা উপনিবেশকারির মাঝে একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অন্যের বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন। প্রথমত তিনি বলেন, অন্যকে সবসময় না সূচক বৈশিষ্ট্যে যেমন: শূন্য, অলস, দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, বিশৃঙ্খল, অসংগঠিত, বোধবুদ্ধিহীন হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। দ্বিতীয়ত অন্যের 'হিউমানিটি' বা 'মানবিকতাকে' প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্পষ্ট, ছায়াময়, অন্ধকারাছন্ন হিসেবে। তাদের সর্ম্পকে প্রায় বলতে শোনা যায় তারা যে কী ভাবে তা কখনো জানতে পারবে না, তারা কী আদৌ কিছু ভাবে? তৃতীয়ত তাদের মানব সম্প্রদায়ের কোনো আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা হয় না, উপনিবেশিতদের দেখা হয় বিশৃঙ্খল, অসংগঠিত ও নামহীন কোনো জনগোষ্ঠীর সমাষ্টির অংশ হিসেবে, যারা দেখতে একই রকম (Memmi 1967: 83-85)।

এডওয়ার্ড সাঈদ তার *Orientalism* পশ্চিম কীভাবে নিজ প্রয়োজনে প্রাচ্যকে নির্মাণ করে, তা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে প্রাচ্যবাদ সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপের আবিষ্কার। প্রাচ্য হলো প্রাচীনত্ব, রোমান্স, উদ্ভট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি স্থান। প্রাচ্য ইউরোপের সবচেয়ে বৃহৎ পুরোনো ও সম্পদসমৃদ্ধ উপনিবেশ। প্রাচ্য হলো পশ্চিমের সভ্যতা ও ভাষার উৎস, এর সাংস্কৃতিক প্রতিপক্ষ। প্রাচ্য তার বিপরীতধর্মী ইমেজ, ধারণা, ব্যক্তিত্ব এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে পশ্চিমকে চিনতে সাহায্য করেছে। এটি যে শুধু কাল্পনিক তা নয়, ইউরোপীয় বস্তুগত সভ্যতা এ সংস্কৃতির

অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো প্রাচ্যবাদ। প্রাচ্য সর্ম্পকে সাঈদ পশ্চিমের দুজন দার্শনিকের দুটো কোটেশন তুলে ধরেন যার মাধ্যমে পাঠকের কাছে স্পষ্টতই নেতিবাচক ভাবে প্রাচ্যকে নির্মাণ প্রক্রিয়া খোলাসা হয়। কোটেশন দুটোর একটি হলো কার্ল মার্ক্সের মতো দার্শনিকের। তিনি প্রাচ্য সর্ম্পকে বলেন, *দে ক্যান্ট রিপ্রেজেন্ট দেমসেলভ, দে মাস্ট বি রেপ্রিজেনটেড।* অপর দার্শনিক হলেন, বেনজামিন দিসরায়িলি। তিনি বলেন, *দি ইস্ট ইজ এ ক্যানসার।* সাঈদ বলেন, প্রাচ্যবাদ অনেক কিছুই হতে পারে। এটি যেমন বিদ্যাজাগতিক তেমনি মতামতও হতে পারে। যে কেউ এই চর্চার শামিল হতে পারেন। যিনি শিক্ষা দেন, লেখেন অথবা প্রাচ্য নিয়ে গবেষণা করেন, সবাই। এটির প্রয়োগ যে কারো দ্বারাই হতে পারে। নৃবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ বা দার্শনিক সবাই এর চর্চা করতে পারেন (Said 2001: 2-4)।

এই ধরনের চর্চার ধারা থেকেই উপনিবেশিত সমাজের শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী চরিত্রের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এই শাসকগোষ্ঠী কীভাবে উপনিবেশিত সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করছে তা নিয়ে জ্ঞান তৈরি করা হয়। একইভাবে উপনিবেশিত সমাজের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী উপনিবেশিত সমাজের শাসক গোষ্ঠী হতে উদ্ধার করেছে, সেই সকল দিকসমূহ প্রাধান্য পায়। হার্ডিম্যান তাঁর *The Indian 'Faction': A Political Theory Examined* প্রবন্ধে দেখান, কিভাবে বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ ভারতবর্ষের রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় দলাদলি প্রত্যয়টি বোঝার উপর জোর দেন। তাঁরা দলাদলি প্রত্যয়টি বিশ্লেষণে বিভিন্নভাবে দলনেতাদের স্বার্থকেন্দ্রিক দলাদলিতে কীভাবে দল অনুসারীরা ব্যবহৃত হয়, তা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে দলনেতারা কীভাবে তাদের অনুসারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত করছে, তারা তা-ও নানাবিধ ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। একইভাবে দলাদলিভিত্তিক এই রাজনীতি কীভাবে অগণতান্ত্রিক, বর্বর, জনগোষ্ঠিকে কুরে কুরে খায় এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, তা-ও বিবিধ কেস হাজির করে যুক্তিযুক্ত করা হয় (Hardiman 1982)।

এই সকল নির্মাণ বর্ণবাদের সাথে যুক্ত। বর্ণবাদী চিন্তা ভাবনা হতে অ-ইউরোপীয় সমাজের জনগোষ্ঠী সর্ম্পকে নেতিবাচক পরিবেশনা দাঁড় করানো হয়। যেমন: থমাস আনড্রিও ১৮৯০ সাল হতে বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত করে ফিজিয়ানদের নরখাদক উৎসবের ছবি হাজির করে ফিজি সমাজের জনগোষ্ঠীর বর্বর জীবন যাপনের বিষয়টি প্রমান করতে চেয়েছেন। ফিজিসহ পলেনেশিয়ায় দ্বীপসমূহের উপনিবেশিক উপস্থাপনায় নারীদের উদ্ভটভাবে বা যৌনময়ী হিসেবে পরিবেশন করা হয়।

রেহনুমা আহমেদ এই ধরনের যৌনময়ী পরিবেশনার রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন। তিনি মালেক আললূলার *দ্যা কলোনিয়াল হারেম* বইটি পর্যালোচনা করেন। যা কিনা আমাদের উপনিবেশিত সমাজ সর্ম্পকে ঔপনিবেশিক পরিবেশনার রাজনীতি বুঝতে খুবই কার্যকরি। রেহনুমা বলেন, মালেক আললুলা ফরাসী উপনিবেশিক শক্তি কিভাবে আলজেরিয় জনগোষ্ঠীকে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে পরিবেশন করেছে, তার রাজনীতি উন্মোচন করেছেন। আললুলার মতে, ইতিহাসে আর অন্য কোনো সমাজের নারীগোষ্ঠী এমন বৃহদাকারে আলোকচিত্রের বিষয় হয়ে

জনদৃষ্টির জন্য অর্পিত হয়নি। তাঁর মতে, উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হতে পাশ্চাত্য ক্রমশ পৌঁছে যায় প্রাচ্যের নিকট। উপনিবেশবাদ থাবা মারে। যুদ্ধের মাধ্যমে তাকে কব্জা করে, শোষণের বিবিধ বন্ধন দ্বারা তার হাত পা বেঁধে ফেলে। উপনিবেশিত সমাজের কাঁচামাল পাশ্চাত্যে পাচার করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ফরাসি সেনাবাহিনী পূর্ব আলজেরিয়ায় পৌছায়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল ধর্মযাজক, পন্ডিত, চিত্রশিল্পীও আলোকচিত্রীর দল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ক্যাম্পের আশেপাশে থাকে ফ্রান্সের সুশীল মানুষজন যাদের দৃষ্টি সর্বদা উদ্ভটতাবাদ, লোকজগল্প ও প্রাচ্যবাদের অন্বেষণে ব্যস্ত। বিদেশি চোখে প্রথমেই আলজেরিয় নারীর অদৃশ্যমানতা ধরা পড়ে। আলজেরিয় নারীরা বোরখা পড়ে, ফলে এক নারী হতে তারা আরেক নারীকে আলাদা করতে পারে না। আলোকচিত্রীর কাছে হারেমের অপ্রবেশ্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আলোকচিত্রী যেখানে ভেবেছিলেন উদ্ভটতাবাদ সহজেই সামালযোগ্য হবে কিন্তু তার শিল্পচর্চা ব্যাহত হয়। তাই উপনিবেশিক আলোকচিত্রীর স্টুডিও তার কামনা পূরণের স্থান হয়ে উঠে। আলোকচিত্রী যে সকল নারীদের প্রবেশাধিকার পান না তিনি তাদের প্রতিরূপ জড়ো করেন। এরা হচ্ছেন মজুরিপ্রাপ্ত মডেল। উপনিবেশে পরিণত হওয়া এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানাদির ভাঙ্গন আলজেরিয় নারী ও পুরুষ উভয়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাদের প্রান্তে ঠেলে দেয়। নারীর জন্য প্রান্তিকীকরণের অবধারিত অর্থ হচ্ছে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ। আলোকচিত্রী প্রয়োজনমাফিক তার স্টুডিওকে সাজান। জড়োকৃত নারীদের ঘোমটা পরার ও ফেলার নির্দেশ দেন। এরপর আলজেরিয় নারীর লুকানোর কিছু থাকে না। এভাবে আলজেরিয় নারীকে পরিবেশন করার রাজনীতি আললুলা হাজির করেন (আহমেদ ২০০৪)।

উপনিবেশিত সমাজের প্রথা নিয়েও নানাধরনের নেতিবাচক উপস্থাপনা দাঁড় করানো হয়। যেমন ভারতবর্ষের প্রথা কিভাবে নারীর জন্য নিপীড়নমূলক তা বোঝাতে হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথাকে টেনে আনা হয়। লতা মনি তার লেখায় এই ধরনের নেতিবাচক উপস্থাপনার ঔপনিবেশিক রাজনীতি তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন, ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু নারীর জন্য এই বর্বরোচিত প্রথা রদ করতে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখান যে, এই প্রথা নিয়ে ধর্ম গ্রন্থে কে ানো নির্দেশনা নাই। এই ধরনের নিয়ম প্রবতর্নের মাঝে একদল ব্যক্তির স্বার্থ নিহিত রয়েছে। যেমন: কোনো পুরুষ মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ, সেই পুরুষের সম্পদ ভোগের স্বার্থ এই সকল উদ্দেশ্য এই প্রথার পেছনে কাজ করে। এই ধরনের জ্ঞান নির্মাণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত জনসমষ্টিকে ভাগ করে ফেলা হয়। একদল ব্যক্তি তাদের প্রথার পক্ষে যুক্তি প্রদান করে অন্যদল ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরে কথা বলে। এই সকল বিভক্তি উপনিবেশিক শক্তিকে উপনিবেশিত জনজীবনে অনুপ্রবেশকে সহজতর করে। নারীকে এখানে উপনিবেশিত জনজীবনে প্রবেশের উপলক্ষ্য হিসেবে নেয়া হয় (Mani 1998)| মাহমুদুল সুমন তার লেখা *"'সাম্প্রদায়িকতা' প্রসঙ্গে একটি মনোলোগ"* এ দেখান, কীভাবে আমাদের এই অঞ্চলে 'সংখ্যালঘু' বা 'সংখ্যাগুরু' ক্যাটাগরি ঔপনিবেশিক শাসনের নানা কৌশলের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এসেছে। যাকে তিনি তাত্ত্বিকদের পরিভাষায় কলোনিয়াল গভর্মেন্টালিটি বলেছেন।

সুমন বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের শাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রদায়ের সর্ম্পক পাল্টে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে কারা 'সংখ্যালঘু' কারা 'সংখ্যাগুরু' তা নির্দিষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে বর্ণভিত্তিক পরিচয় পোক্ত হয়েছে সেনসাস কার্যক্রমের মাধ্যমে। তিনি বেনেডিক্ট এন্ডারসনের বক্তব্য তুলে ধরেন। বেনেডিক্ট এর মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এথনিক রাজনীতি আধুনিক সময়ে প্রোথিত, এবং এক্ষেত্রে কোনো আদি-অকৃত্রিম ইতিহাস খুঁজতে যাওয়ার দরকার নেই। এই রাজনীতি মূলত নির্ধারিত হয়েছে ঔপনিবেশিক পলিসির মধ্য দিয়ে। খুব অল্প সময়ের পরিসরে এক সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের মানুষের সর্ম্পকের বদল ঘটে। 'সহিষ্ণুতার' সর্ম্পক 'সহিংসতায়' রূপ নেয়। এই সহিংসতা ঔপনিবেশিক শাসককে তার শাসন প্রতিষ্ঠায় সুবিধা প্রদান করে (সুমন ২০১১: ১০৭-১১৬)।

একইভাবে এই অঞ্চলের সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্ণপ্রথাকে যুক্ত করে দেখা হয়। তাদের মতে, বর্ণপ্রথা হলো স্তরায়িত ব্যবস্থা। এই স্তরায়িত ব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে অবস্থান করে ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষজন। উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণরা অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করে নিজেরা সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গণতন্ত্র চর্চিত হয় এই বার্তা ও তারা সমান্তরালে প্রদান করে। এইভাবে ভারত সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে নিচু গণ্য করা হয়। এর মাধ্যমে উপনিবেশকারি এই বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের এই প্রক্রিয়াকে বৈধ করেন (Dumont 1980)। লতা মনি ঔপনিবেশিক নির্মাণ সর্ম্পকে বলেন, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বিবিধ ঐতিহ্য তৈরি করেন। যেমন সতী। তিনি উপনিবেশিক ভারতে সতী বিষয়ক বির্তকের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমান করেন উপনিবেশিক ভারতে সতী বিষয়ক বির্তক কিভাবে উপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরে গড়ে উঠেছিলো। এই প্রক্রিয়াকে ফুকোর ডিসকোর্স প্রত্যয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। উপনিবেশিক ডিসকোর্সের মাধ্যমে উপনিবেশকারি ও উপনিবেশিতের মাঝে বর্ণগত, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ভিন্নতা প্রতিষ্ঠাসহ বিবিধ কৌশলের মাঝে জনগণকে অধীনস্তকরণের পরিসর তৈরি করা হয়। উপনিবেশিক ডিসকোর্সের মাঝেই চর্চিত হয় ক্ষমতা। এর মাঝেই উপনিবেশিত জনগোষ্ঠির বর্নগত উৎসের ধরন তৈরি করে তাদের পরিভ্রষ্ট জনগোষ্ঠি হিসেবে হেয় করা হয়। শুধু তাই নয় উপনিবেশিক ডিসকোর্সের মাধ্যমে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠির বিবিধ কর্মকান্ডকে হস্তক্ষেপ করা হয়।

হোমি ভাবা উপনিবেশিক সংস্কৃতিকে বুঝতে সংস্কৃতি ও সরকার, জ্ঞান ও গর্ভনমেন্টালিটি বিষয়সমূহ নিয়ে আসেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য গভীরভাবে ও সমঝোতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, একটি অন্যটিকে খর্ব করে না। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে হোমি ভাবা বলেন, প্রথাগত ইতিহাসে এটিকে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে থমাসের অভিমত হলো, উপনিবেশিক আমলে স্বাস্থ্য শিক্ষা সংক্রান্ত এই প্রকল্পসমূহকে বিকল্প হিসেবে পাঠ করা যায়। তাঁর মতে, এগুলো উপনিবেশিত জনগোষ্ঠিকে নজরদারিত্বের পথ তৈরি করে। এই প্রকল্পসমূহ জ্ঞান নির্মাণ করে যা থমাসের মতে

সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চিহ্ন, রূপক বা বয়ানের মাধ্যমে চলমান বা টিকে থাকে। ফুকোর মতে, এই চিহ্ন, রূপক, জ্ঞান সবই ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফুকোর মতে, ক্ষমতার সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অধীনস্ততার বিবিধ ধরনসমেত প্রয়োগ বা ব্যবহারের প্রবণতাসমূহ ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত থাকে। সেইক্ষেত্রে উপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের কার্যসমূহ বিচার বিশ্লেষণে ফুকোর ক্ষমতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নতুন ভাবে পথ বাৎলায়। কারণ তিনি ক্ষমতাকে শুধুমাত্র নিপীড়ন, শোষণ ও দমনের মাধ্যমে দেখেননি। তার মতে ক্ষমতা উৎপাদিত হয়, এটি বাস্তবতা উৎপাদন করে, বস্তুর পরিধি নির্ধারণ করে ও একইসাথে সত্যের প্রথা তৈরি করে। ফুকো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে শুধুমাত্র দমনের সাথে যুক্ত করেননি বরং এর ডিসকার্সিভ ও এপিসটোমোলোজিক্যাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন। মার্ক্স যেভাবে রাষ্ট্রকে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের মেকানিজম হিসেবে বুঝেছেন, ফুকো সেভাবে বোঝেননি। ফুকো গর্ভনমেন্টালিটিকে প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া, বিশ্লেষণ এবং প্রতিফলনের সমাবেশ হিসেবে দেখেন যা কিনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের মাধ্যমে জনসমষ্টির উপর ক্ষমতার চর্চা করে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পুর্বে পরিবার কেন্দ্রে ছিলো, পরবর্তীতের সমাজ সমষ্টি কেন্দ্রীয় জায়গায় ও পরিবার দ্বিতীয় সারিতে মনোযোগ পায়। পশ্চিমে রাষ্ট্রীয় এই শাসন দীর্ঘমেয়াদী ও সুক্ষ। ফুকোর মতে, রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণের কৌশল বিকৃত নয়, এটি ডিসকার্সিভ, প্র্যাকটিক্যাল ও লোকালাইজড। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম বিস্তারের যুক্তিসমূহ দর্শনসমূহ সর্ম্পকে বলেন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পোক্ত হয়। যুক্তি ও দর্শন অনুযায়ী যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা গর্ভনমেন্টের পক্ষে কাজ করে। তাই উপনিবেশিক পরিবেশনা গভর্নমেন্টালিটি হিসেবে কাজ করে (Thomas 1996: 41-43)।

আধুনিক রাষ্ট্র পলিসি বা বিবিধ নীতি প্রণয়ন করে জনগণের ব্যক্তিজীবনের নজরদারিত্ব স্থায়ীত্ব করার এই প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে ফুকো গুরুত্ব দেন। তাই তাঁর মতে, ক্ষমতা সর্বত্র বিস্তৃত জালের মতো, কোনো কেন্দ্র থেকে চর্চিত হয় না। ফুকোর এই ব্যাখ্যা উপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশ্লেষণে অধিক কার্যকরি কেননা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উপনিবেশিত সমাজে তার শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে যে পথসমেত তৈরি করে সেগুলো বিনা প্রতিরোধে উপনিবেশিত জনগন মেনে নেয়নি। বরং জনগণ বিভিন্ন পরিসরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এটি জনগণের ক্ষমতা যা কিনা উপনিবেশকারিকে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কাঠামো বা কৌশলকে পরিমার্জনে বাধ্য করে। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদরা উপনিবেশিত সমাজের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও তাদের প্রতিরোধের ইতিহাস তুলে ধরেন। যেমন রনজিৎ গুহ তার *Small voice of History* প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী উপনিবেশবাদকে কিভাবে প্রতিরোধ করেছে তা সূক্ষ সূক্ষ ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগের ধারণা ও আরোগ্য লাভের যে পথ উপনিবেশিত জনজীবনে নির্দেশিত হয় তা জনগণ প্রথমেই মেনে নেয়নি। এইভাবে নিম্নবর্গীয় অনেক ইতিহাসবিদগণ তাদের লেখায় উপনিবেশিত মানুষের উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, তাদের সক্রিয়তা তুলে ধরেছেন। তবে তাদের এই সক্রিয়তা তাদের জন্য তেমন কোনো সুবিধা বয়ে

আনতে পারেনি। বিশাল এই শক্তির বিরুদ্ধে তারা যেভাবে সোচ্চার হয়েছে তার ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের সাথে কখনো কখনো নেগোসিয়েশনে গিয়েছে। ফলে উপনিবেশিত ও ঔপনিবেশিক শক্তি এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যায়।

উপরোক্ত আলোচনায় ঔপনিবেশিক শক্তি কী কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রবেশ করে, তাদের জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ও তাদের স্থানচ্যুত করে, সেই সকল দিকসমূহ উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বিস্তারের এই কৌশলসমূহ বুঝতে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদ ডেভিড হার্ডিম্যানের ড্যাং অরণ্যবাসীদের নিয়ে লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তিনি ড্যাং অরণ্যবাসীর ১২০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে দেখান কীভাবে উপনিবেশিক শক্তি ড্যাং অরণ্যবাসীদের তাদের নিজস্ব জমির অধিকার হতে চ্যূত করে। শুধু তাই না উপনিবেশিক শক্তি কিভাবে তাদের ক্ষমতা ব্যবস্থা ও জীবনব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়েছে, সেইক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কী রূপ ছিল, তাও তিনি এই লেখায় তুলে ধরেছেন। এই সকল দিক বিবেচনায় লেখাটি পর্যালোচনা করার প্রয়াশ নেয়া হয়েছে।

ড্যাং অরণ্যবাসীর জীবনে ঔপনিবেশিকতা

ডেভিড হার্ডিম্যানের "Power in the Forests: The Dangs, 1820-1940" প্রবন্ধটি মোট সাতটি অংশে বিভক্ত। তিনি পুরো প্রবন্ধটিতে ড্যাং অরণ্যবাসীদের মাঝে ক্ষমতার ধরন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রাক উপনিবেশিক আমলে ড্যাং অরণ্যে ক্ষমতার রূপ কী ছিলো। উপনিবেশিক আমলে সেটি কীভাবে রূপান্তরিত হলো এবং উপনিবেশ-উত্তর সময়ে ড্যাং অরণ্যবাসীর পরিণতি কি হয়েছে তা তিনি লেখাটিতে সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। লেখাটির প্রথমে ভূমিকাতে গত কয়েক বছর ধরে ভারতের অরণ্যবাসীদের উপর ঔপনিবেশিক বনসংরক্ষণ নীতির প্রভাব নিয়ে যে নানাবিধ অধ্যয়ন করা হয়েছে তিনি সেই সকল অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে বলেন। তাঁর মতে, এই সকল অধ্যয়নে দেখানো হয়েছে উপনিবেশিক বননীতির কারণে বনের বাসিন্দারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও তারা ভোগান্তির মধ্যে আছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ভারলী বনবাসীদের নিয়ে উইনিন পেরিরা এবং জেরিমি সিব্রুক এর কাজ উল্লেখ করেন। এই দুই লেখকের মতে, ভারলি সমাজ হলো সমতাভিত্তিক। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্যান্যদের শোষণ বা ক্ষতি না করেই পরিবেশের সাথে খুবই ঐক্যতান বজায় রেখে বসবাস করছে। কিন্তু উপনিবেশিক আমলে বহিরাগতরা এসে তাদের ভূমি দখল ও তাদের শোষণ করে নিম্নবর্গীয় শ্রেণীতে পরিণত করে। বনবাসীদের নিয়ে এই গঁৎবাধা নির্মাণকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী যে লেখালেখি সেখানেও এই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই নির্মাণ শুধু স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে করা হয় তা নয়, বৃহৎ ভারতীয় সভ্যতার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে।

জাতীয়তাবাদী লেখকরা যুক্তি দেন, ভারতের জনগোষ্ঠীর সদিচ্ছা পশ্চিমা জনগণের তুলনায় উচ্চমার্গীয়. বন্দনা শিবাও তার বই *Staying Alive* এ একই ধরনের যুক্তি দেয়। তাঁর মতে, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মাঝে বনের প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লুকিয়ে রয়েছে। বনে যে

সাধুরা ধ্যান করতো সেগুলো বিভিন্ন বইয়ে গ্রথিত হয়েছে। সাধুদের এই ধ্যান যা উপনিবেশিক শাসন আমলে বন্ধ হয়েছে। এই লেখাসমূহই পশ্চিমাদের বিপরীতে ভারতকে হোমোজেনাস করেছে। হার্ডিম্যান বলেন, পরিবর্তিত এই গঠনকে পার্থ চ্যাটার্জী reversed orientalism হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এর ফলেই এই ধরণের যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয়রা বন সংরক্ষণকারী এবং পশ্চিমারা বিনাশকারী। এই ধরণের এসেনসিয়ালিস্ট বোঝাপড়ার কারণে উপনিবেশিক আমলের অনেক আগে থেকেই যে ভারতে বননিধন শুরু হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার পথ রুদ্ধ হয়। তিনি এই বনবাসী সংক্রান্ত নির্মাণকে সমালোচনা করে প্রাক-উপনিবেশিক আমলে ড্যাং বনবাসীর জীবনযাপন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনায় এনে ঔপনিবেশিক আমলে কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিক শাসক তাদের জীবনযাপন প্রণালীর পরিবর্তন ঘটিয়েছে, সেক্ষেত্রে ড্যাং জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কী ছিলো, তা উপস্থাপন করেন। অরণ্যবাসী সম্পর্কে যে গঁৎবাধা ধারণা যে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার পূর্বে তাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতার সম্পর্ক ছিলো না তিনি এর বিপরীতে যুক্তি দেন। তিনি বলেন, পূর্বে ও তাদের সমাজে ক্ষমতার চর্চা ছিলো। উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী সেটি আধিপত্য বিস্তারে কাজে লাগিয়েই তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে ও রূপান্তর ঘটিয়েছে। তবে তারা সহজেই আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি। ড্যাং অরণ্যবাসীদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের মুখে তারা তাদের আধিপত্য বিস্তারের কৌশল পরিমার্জন করেছে। উপনেবিশিক আমলেও ড্যাং দের মাঝে যে ক্ষমতার চর্চা সেটিও তিনি দেখিয়েছেন। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিবিধ কর্মসূচি বা শাসন প্রক্রিয়ার তারা যেভাবে ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সমীভূত হয় তাও তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন।

দক্ষিণ গুজরাটের সমতল ভূমি এবং জাহিয়াদ্রিস পর্বতের মাঝে ড্যাংদের অবস্থান। পর্বতের পাদদেশ সমৃদ্ধ এলাকা এটি যা দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। এই অঞ্চল ঘন বনে পরিপূর্ণ ছিলো এবং মনে করা হতো মধ্যযুগে এই অঞ্চলের বনভূমিতে বহিরাগত সেনাবাহিনীর প্রবেশ ছিলো অসাধ্য। উপনিবেশিক শাসন আমলের পূর্বে এই বনভূমি ভীল প্রধানদের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ১৮৩০ সালে জেমস অট্রার্ম এই অঞ্চল দখল করে। ১৮৪০ সালের পর হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বন থেকে একচেটিয়াভাবে বাঁশ সংগ্রহ করতে থাকে। উনবিংশ শতকের দিকে এটি বনবিভাগের অধীনে বনসংরক্ষণ এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, এই সময় শিফটিং চাষাবাদ বন সংরক্ষণের জন্য ধ্বংসাত্মক মনে করা হয় এবং বনবিভাগের কর্মকর্তারা এই চাষাবাদের চর্চাকে বাতিল করে। তারা অরণ্যবাসীদের সিডেনটারি চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন প্রণালী পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে। উপনিবেশিক শাসকরা যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিয়ে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। তবে, পরবর্তীতে উৎপাটন সহজ হয়। ডেভিড হার্ডিম্যান ডাংদের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক ও একই সাথে উপনিবেশিক কর্মকর্তাদের বিজয় প্রক্রিয়া পরীক্ষা করেন। তিনি ভীল এজেন্টদের কার্যক্রম, বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেক্ষিত সব কিছু পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন, উপনিবেশিক কর্মকর্তাদের মূলত দুটি লক্ষ্য ছিল - একটি হলো জনগণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং অন্যটি হলো কাঠ সংগ্রহ ত্বরান্বিত করা। এই লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে তাদের সমাজের

ক্ষমতা পরিবর্তিত হয় এবং শাসকগোষ্ঠী হিসেবে ভীলদের যে অবস্থান ছিলো তা সময়ের সাথে মলিন হয়ে তারা নিম্নবর্গীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

লেখার দ্বিতীয় অংশে তিনি প্রাক উপনিবেশিক আমলে জীবনপ্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন আমলের পূর্বে ড্যাং আদিবাসী অঞ্চলে সামাজিক স্তরায়ন ছিলো। সেখানে ভীল প্রধান শাসন করতো, তাদের যে আত্মীয় স্বজন ছিলো, তাদের "ভাওবন্ড" সম্বোধন করা হতো। সাধারণ ও অধঃস্তন কৃষকরা গাভীতস বা গ্রামবাসী হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের সমাজ জাতি বা বর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা বিভক্ত ছিলো। এই অঞ্চলে ১২১৬-১৩১২ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলো গাভালি রাজারা, তাদের পরাজিত করে ভিলরা এই অঞ্চল দখল করে। কনকানারা ও দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল হতে ভীলদের মতোই প্রায় একই সময় চারশত বছর পূর্বে আসে। ভীলরা শিফটিং চাষাবাদ করতো। তবে এটি তাদের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত ছিলো না। চাষাবাদের পাশাপাশি তারা শিকার ও সংগ্রহ করতো। তবে বাইরের অর্থনীতির সাথে তাদের সংযুক্ততা বেশ ভালো ছিলো।

লেখার তৃতীয় অংশে তিনি কখন কোন্ এলাকা দখলের মধ্যে দিয়ে উপনিবেশিক শক্তি ড্যাং অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কী প্রক্রিয়ায় একে একে তাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করে, তা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ১৮১৮ সালে ঔপনিবেশিক শক্তি পূর্ব ড্যাং অঞ্চল দখল করে। একই সময়ে এখানে খান্দেশ জেলা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ড্যাংদের উপর উপনিবেশিক শক্তি সক্রিয়ভাবে প্রথম হস্তক্ষেপ শুরু করে ১৮২২ সালে। উপনিবেশিক শক্তি তাদের সামরিক বাহিনী পাঠায়। তারা ভীলদের সাথে নেগোসিয়েশনের জন্য কিছু ভীল এজেন্ট ঠিক করে। এই এজেন্টরা ভীলদের শান্ত রাখতো এবং তাদের নিরাপত্তা দিতো। এছাড়া ভীল যুবকদের শান্ত রাখার জন্য একজন স্বতন্ত্র কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, যিনি যুবকদের কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি না দিয়ে বরং তাদের বুঝিয়ে বলতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, শক্তভাবে কিছু বলার মধ্য দিয়ে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। ভীল এজেন্টরা ভীলদের জীবন-যাপন প্রণালীর নানাদিক পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতো। যেমন: তাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসতি স্থাপন, অন্য এলাকায় আক্রমণ না করা, শিকার- সংগ্রহ ও শিফটিং চাষাবাদ বন্ধ করার ব্যাপারে পরামর্শ দিতো এবং নির্দিষ্ট এলাকায় চাষাবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করতো। ১৮৩৪ সালে খানদেশ কর্তৃপক্ষ ড্যাং বন অঞ্চলে বণিকদের প্রবেশের ও ভীলদের ঋণ প্রদানের জন্য উৎসাহ প্রদান করে, যাতে ভীলরা ঋণ নিয়ে স্থায়ীভাবে চাষাবাদ করতে পারে। এমনকি কর্তৃপক্ষ বাইরের কৃষকদেরও ড্যাং অঞ্চলে এ বসবাস করে জমি চাষাবাদে উৎসাহ দিতেন। এখানে বন সংরক্ষণের পরিবর্তে বন পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অনেক জোর দেয়া হয়েছিলো। এই ধরণের শাসন প্রক্রিয়াকে (যেমন তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা, উপনিবেশিক আইনের কঠোর প্রয়োগ) আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ভীলদের জন্য অনেক সুবিধা এনেছে। কিন্তু এর দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল খুবই খারাপ ছিলো। তবে ব্রিটিশরা ভীলদের খুব বেশি শাসন করতো না, কারণ উপনিবেশিশকারীরা তাদের জাতি ভাবনা থেকে নিজেদের উৎকৃষ্ট মনে করতো আর ভীলদের স্থানীয় এবং পশ্চাদপদ বলে চিহ্নিত করতো। তাই তারা মনে করতো যে এই ধরনের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সাথে গম্ভীর ব্যবহার করার কোনো

প্রয়োজনীয়তা নেই। ১৮৩০ সালের শেষের দিকে ব্রিটিশদের দ্বারা কিছু স্থানীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। ১৮৩৮-১৮৩৯ সালে গাডভির নতুন প্রধান উদয় সিং ব্রিটিশ গ্রাম আক্রমণ করে। এই সময় ভীল এজেন্ট বগলাস গ্রাহাম অনুধাবন করেন যে, কেন গাডভি প্রধান ব্রিটিশ গ্রাম আক্রমণ করেছে। ব্রিটিশরা আক্রমণের এই ঘটনাকে গাডভি প্রধানদের সাথে ভিল এজেন্টদের সভা না করার ফলাফল হিসেবে দেখেন। ১৯৪৩ সালে প্রথমবার তাদের সাথে সভা হয়। গ্রাহাম পিমপালনার প্রধানের সাথে মিলিত হলে পিমপালনার-রা অভিযোগ করে তারা গেইকওয়াড-এর কিছু কর্মকর্তাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। এই সকল অভিযোগ মীমাংসা করার জন্য বার্ষিক সভা হয়, যেখানে খান্দেশের এজেন্ট অথবা কালেকটরগন মিলিত হন। এই সভায় তারা দ্বন্দ্বগুলি মিটমাট করে। পরবর্তীতে এটি বার্ষিক *দরবার* হিসেবে রূপ লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হতে সাধারণত প্রত্যেক বছরের মে মাসে পিমপালনার অথবা খান্দেশের সীমান্ত এলাকার যে কোনো একটি গ্রামে এই *দরবার* অনুষ্ঠিত হতো। এই *দরবার* শীঘ্রই ঐতিহ্যে পরিণত হয়। দরবারের ধরন এই রকম ছিলো যে, গোষ্ঠী প্রধানগণ তাদের "ভাওবন্ডদেও" নিয়ে আসতো। তারা ক্যাম্প স্থাপন করে কয়েকদিন অবস্থান করতো। সেখানে সরকারী খরচে তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হতো। ঐ দিন দরবারে গোষ্ঠীপ্রধানরা ভীল এজেন্ট বা কালেকটরদের প্রতি তাদের যে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারতো। শুধু মাত্র তারাই অভিযোগ করতো না, গ্রামবাসীরাও তাদের প্রধানের মাধ্যমে তাদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ করার সুযোগ পেতো। এই দরবারে যে ব্যক্তি ভালো বক্তব্য দিতো তাকে পাগড়ীর কাপড় উপহার দেয়া হতো। দরবারের কার্যক্রমের বর্ণনায় দেখা যায় যে, গোষ্ঠিপ্রধানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের আনাড়ীপনা ফুটে উঠত। দরবারে উপস্থিতি ছিলো বাধ্যতামূলক। কারণ দরবারে অংশগ্রহণ না করার অর্থ হলো ব্রিটিশ সামাজ্যের প্রতি অবাধ্যতা ঘোষণা। দরবারে উপস্থিতদের বিশেষ পোষাক দেয়া হতো। চারজন বড় গোষ্ঠী প্রধানকে রাজা উপাধি এবং বাকী নয়জনকে নায়েক উপাধি দেয়া হতো। এই দরবারে ব্রিটিশ সরকার হঠকারি আচরণ করতো। তারা প্রচুর খাবার ও মদের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী প্রধানদের দরবারে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রলোভন দেখাতো, অন্যদিকে তারা মদ্যপ হলে ব্রিটিশরা তাদের সমালোচনা করতো। কারণ মদ্যপ অবস্থায় প্রধানরা প্রায়শ মঞ্চে উঠে তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতো। তবে তারা ১৮৯৪ ব্রিটিশদের অরণ্য অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে। এর মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে, ব্রিটিশরা ভীলদের কতটা মন জয় করতে পেরেছিল।

লেখক লেখার পরবর্তী অংশসমূহে কী প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশরা বনের কাঠ সংগ্রহ করে ও তাদের প্রয়োজনে কাজে লাগায় তা তুলে ধরেছেন। এ নিয়ে ব্রিটিশদের সাথে ড্যাং গোষ্ঠীর নানা টানাপোড়েন এবং শেষ পর্যন্ত তারা কী প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গীয় শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হয়, তা বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্য উন্নতমানের কাঠের প্রয়োজন ছিল। ১৮৪২ বয়চি, গাডহবি, বাসুরনা ও পিমপ্রিলি গোষ্ঠীপ্রধানদের বুঝিয়ে ব্রিটিশরা গাছের গুঁড়ি সংগ্রহ শুরু করেন। গোষ্ঠী প্রধানরাও বেশি অর্থের জন্য ব্রিটিশদের গাছ সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু গোষ্ঠী প্রধানদের কাঠের মূল্যের চেয়ে অনেক কম অর্থ দেয়া হয়। তারপরও গোষ্ঠী

প্রধানরা লীজে স্বাক্ষর করে। এর ফলে তারা বনের কাঠের গুড়ির উপর অধিকার হারায়। বন থেকে গাছের গুড়ি ও কাঠ সংগ্রহ বনের জন্য ক্ষতিকর বিধায় বনসংরক্ষণ কর্মকর্তারা এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী মনোভাব ড্যাং অরণ্যবাসীর জীবন হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এর সাথে শুরু হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৮ ও ১৯ শতকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কৃত হয় যে, গাছপালা বৃষ্টিপাত তৈরির প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এই জ্ঞান উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষরা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। তারা বনবাসীদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। সভ্যতা যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সেটা নিয়ে নানাবিধ তত্ত্ব উত্থাপিত হয়। বনকে রক্ষা করতে হবে এই মনোভাব অরণ্যবাসীর জন্য হিতকর না হয়ে বরং উল্টোটা হয়। কারণ এই ধারণার ফলে অরণ্যবাসীরা যে শিকারের উপর নির্ভরশীল ছিলো তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অরণ্যবাসীরা অনেকেই বন্দুক দিয়ে শিকার করতে পছন্দ করতো না। এই বিভক্তি বা এই দ্বন্দ্বসমূহের কারণে বনবিভাগের কর্মকর্তাদের কাজ করা অনেক সুবিধা হয়েছিল। তারা প্রথমে ৫০ বছরের লীজ নেয় এবং বন নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। জাহাজ তৈরির জন্য সেগুন কাঠের পুরো প্রয়োজনই বন থেকে সংগৃহ করা হতো। এরপর রেলওয়ে তৈরির জন্য কাঠের প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। বন সংরক্ষণের জন্য কর্মকর্তারা কিছু আইন নির্দিষ্ট করে দেয় যা ড্যাং-এরা গ্রহণ করে। কিন্তু আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকগুলি বাস্তবিক জটিলতা দেখা যায়। কিছু এলাকা সংরক্ষণ করা হতো যেখানে চাষাবাদ করতে দেয়া হতো না। কিন্তু সেই সকল এলাকায় শিকার করা যেতো কারণ, খরার সময় তাদের শিকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সংরক্ষণের জন্য ভীল প্রধানরা কোনো কর পেতো না। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব হতো। ব্রিটিশ সরকার বেশ কয়েকজন প্রধানকে হাতে রেখেছিল। যারা কিনা সংরক্ষণের পক্ষে ছিলো। এই সকল ঘটনায় ড্যাং দের ক্ষমতা সম্পর্ক খুবই জটিল হয়ে যায়।

১৯০৬ সালে ড্যাং এর প্রশাসনের দায়িত্ব খান্দেশ কর্তৃপক্ষ হতে Forest Department of Bombay Presidency -এর উপর বর্তায়। এর ফলে ভীল এজেন্ট তার ক্ষমতা হারায়। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এই অঞ্চলের সহকারী রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাকে বিচার করার ক্ষমতাও প্রদাণ করা হয়। হডসন এই দায়িত্ব পান। তিনি সকল অপরাধ মামলার নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব পান এবং ড্যাং-এদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। আহওয়াকে ড্যাং এর প্রশাসনিক কেন্দ্র বানানো হয়। এরপর হডসন এখানে মেডিক্যাল ডিসপেনসারি বানানোর উপদেশ দেন। ১৯০৩ সালে দালান তৈরি করা হয়। ড্যাং-এরা দালান তৈরি করতে পারত না বিধায় বাইরে থেকে শ্রমিক আনা হয়। বনবিভাগের রেস্ট হাউজ বানানো হয়। সেখানে বাজার স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, যদিও তা সফল হয়নি। ১৯০৫ হতে ছোট সাপ্তাহিক বাজার শুরু হয়। পুলিশ বাহিনীও কাজ শুরু করে। এরপর হডসন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য রাস্তা করেন ও বনের বিভিন্ন স্থানে রেস্ট হাউজ স্থাপিত করেন। কুয়া খনান করে খাবার পানির ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। মিশনারি শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু হয়। তারা ১৯০৯ সালে তিনটি ও

১৯১২ সালে ছয়টি গ্রাম্য স্কুল স্থাপন করে। তবে ভীলরা এই পদক্ষেপগুলি ভালভাবে গ্রহণ করেনি। আহওয়া প্লাটিয়েন-এর প্রধান এই পদক্ষেপগুলির প্রতিবাদ করে। তারা মনে করতো ঔপনিবেশিকরা তাদের ছেলেমেয়েদের চুরি করার জন্য এসেছে। বিশেষত হিন্দুরা খুবই বিরক্ত হয়। উপনিবেশিক শক্তি আরো নতুন নতুন দালান তৈরি করে। ভাল যোগাযোগের জন্য অনেক গাছ কেটে ফেলে। তাদের প্রয়োজনে গাছ কেটে বন উজাড় করা হয়। কিন্তু এই আচরণকে ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বনভুমি পোড়ানোর বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরপরও অনেক ভীল নিজেদের চাষাবাদ পদ্ধতিতে চাষাবাদ বহাল রাখে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। গাভিতরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এইসকল ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। এই ইস্যুতে পুলিশ আসে। যেমন- আমলার- রাজাপুত্র ও আহওয়া-এর কনকানা প্রধানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। যখন আহওয়া প্রধান মারা যায় আমলার রাজপুত্র এসে তার পরিবারের জন্য একজোড়া বলদের দাবি করে। এটি তাদের প্রাচীন প্রথা। কিন্তু প্রধানের পরিবার রাজী হয় না। প্রধান পুলিশকে জানালে পুলিশ রাজপুত্রকে মারে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীর, ধনুক এবং বন্দুক ব্যবহার করে যুদ্ধ হয়। এভাবে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রধানরা ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিবাদ করে ও আইন অমান্য করবার কারণে জেলে যায়। অনেকে সরকারকে জরিমানা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্বের সময় অনেক ভীল বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহকে বন ধ্বংস হিসেবে চিহ্নিত করে তা দমন করতে পুলিশ পাঠানো হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ড্যাং বন হতে ব্রিটিশরা অনেক লাভবান হয়। তারপর আমেরিকান মিশনারিরা তাদের বসতি স্থাপন করে, দুর্ভিক্ষ হয়, লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে বনের উপর তারা তাদের অধিকার হারায়। তারা অতীতকে স্মরণ করে। তারা তাদের উত্তরাধিকার হতে বিতাড়িত হওয়ার কারণে এবং তাদের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করবার জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করে। তারা তাদের ভাল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করে। তাদের মধ্যে যারা সংস্কারক ছিলো তারা ভীলদের খারাপ আত্মার উপর বিশ্বাস ত্যাগ করতে বলে পাশাপাশি তাদের প্রতিদিন গোসল করার নির্দেশ দেয়। তারা পবিত্রতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের তাগিদ বোধ করে। তাদের মাঝে এই বোধের বীজ বপন করা হয়। এর ফলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তাদের অভ্যাস ও প্রথা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা সেটা অর্জন করবে। কিছু কনকানাস যারা গান্ধী কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা শুরু করে। জীবনযাপন প্রণালী পরিবর্তনে তারা অনেক বেশি সক্রিয় ছিলো। কিন্তু ১৯২৩ এর পর প্রায় ২৫ বছর ব্রিটিশ সরকারের জোর বিরোধিতার কারণে এই কর্মীরা ড্যাং-এদের ভেতর প্রবেশ করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গান্ধীপন্থী নেতা, ছোটভাই নায়ক ড্যাং-এ বসবাস শুরু করে এবং বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে হাত দেয়। এইভাবে উপনিবেশিক শাসন ড্যাং দের দুই ধরনের বিপরীত হীনমন্যতার মানসিকতা তৈরি করে। এক হলো: ভীলরা যে অরণ্যে ক্ষমতাসীন ছিলো সেটা তারা স্মৃতিচারণ করে ও দুই হলো: কনকাসাস যারা গান্ধী কর্মসূচির মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ খুজে পায়। এই ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে একত্রিত না করে বিভক্ত করে। স্বাধীনতা উত্তর কনকাসাসরা গান্ধীপন্থীদের হয়ে কাজ করে

গান্ধীপন্থীদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে ভীলরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদ্ধতিকে অস্বীকার করে। তারা নয়াদিল্লীতে আদিবাসী রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে। যা কিনা তাদের নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞানকে ইঙ্গিত করে। যদিও তারা দৈনন্দিন জীবনে অনেক জটিলতার মুখোমুখি হয়।

উপসংহার

আমাদেও দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ পরিবর্তনের পেছনে যে ক্ষমতার সর্ম্পক ক্রিয়াশীল তা বিশ্লেষণে তাত্ত্বিকরা উপনিবেশবাদ প্রত্যয়টি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। উপনিবেশবাদের ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে যে নানাবিধ দুঃখ দূর্দশার সূচনা হয়েছে সে বিষয়টিকে তারা তাদের অধ্যয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যদিকে একদল লেখক উপনিবেশবাদকে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জীবনে আর্শীবাদ হিসেবে বুঝে থাকেন। কারণ তারা মনে করেন উপনিবেশিত সমাজ খুবই পশ্চাদপদ। তাদের 'আধুনিক' ও 'উন্নত' জীবনে উত্তোরণ সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিক সময়কালে, তাদের হাত ধরে। এই দুই ধরনের লেখালেখিতে উপনিবেশবাদকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক ধারণায় সীমায়িত করা হয়েছে। এ থেকে বেরিয়ে কিছু তাত্ত্বিক উপনিবেশবাদকে বুঝেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। তাদের মতে, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। উপনিবেশবাদের ফলাফল শুধুমাত্র ইতিবাচক বা নেতিবাচক এভাবে না বুঝে বরং কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী সর্ম্পকে জ্ঞান নির্মাণ করা হয় এবং নানবিধ কর্মসূচি যেমন: স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, 'আধুনিক' চিকিৎসা ব্যবস্থায় জনমানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা ও 'আধুনিক' চাষাবাদে অভ্যস্ত করা হয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে অনুপ্রবেশ ও রূপান্তর ঘটায়, তা অনুসন্ধান করা জরুরি। তাদের মতে. এই রূপান্তর বা উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর জীবনে আধিপত্য বিস্তার করা উপনিবেশিক শক্তির জন্য সহজতর নয়। এইসকল রূপান্তর কর্মসূচিতে খুব সহজেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব হয় না। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ একই সাথে চলমান থাকে। তবে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে না। ফলে তারা এই ব্যবস্থায় সমীভূত হয়। সমীভূত অবস্থায় তাদের মধ্যে প্রতিরোধের মনোভাব দেখা যায় যদিও এটি তাদের জীবনে খুব বেশি পরিবর্তন আনতে পারে না। ১৮২০ হতে ১৯৪০ সালের মাঝে ব্রিটিশদের নানাবিধ কর্মসূচি দ্বারা ড্যাং অরণ্যবাসীর জীবন-যাপন প্রণালী কিভাবে পরিবর্তিত হয়, এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে উপনিবেশবাদের ফলাফল চিহ্নিত করা যায়। ব্রিটিশদের নানাবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে ড্যাং অরণ্যবাসীরা অরণ্যের উত্তরাধিকার হারায়। তবে এই আধিপত্য বিস্তারের পথ সহজ ছিল না। উপনিবেশিত মানুষের নানাবিধ প্রতিরোধের মুখে ঔপনিবেশিক শক্তি নানা পথে এগিয়েছে, নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। উপনিবেশিত মানুষের সাথে অনেকাংশে দরদস্তুর করেছে। তাই উপনিবেশিত মানুষের অভিজ্ঞতা বুঝতে উপনিবেশিক শক্তির এই আধিপত্য বিস্তারের কৌশলসমূহ উন্মোচন করা জরুরি। উপনিবেশবাদের মাধ্যমে উপনিবেশিত ও উপনিবেশকারীর মাঝে যে ক্ষমতা সর্ম্পক

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করা ও এই ক্ষমতা সম্পর্ক কীভাবে উপনিবেশিত মানুষের জীবনের নানা দিক পরিবর্তন করেছে তা বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যপঞ্জী

Asad, T. 1990. The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology. In James Cliford and George, E. Marcus. eds. *Writing Culture*, Delhi: Oxford University

Chakrabarti, Dilip K. ??? *Colonial Indology: Socio-Politics of the Ancient Indian Past.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Pub. Pvt. Ltd.

Chandra, B. 1999. *Essays on Colonialism.* New Delhi: Orient Longman Limited.

Dirks, Nicholas, B. 2001. *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India.* Princeton University Press.

Dumont, L. 1980. *Homo Hierarchicus: The Caste Systems and its Implications.* Delhi: Oxford University Press.

Fuller, Chris J. 1996. *Caste Today.* Delhi: Oxford University Press.

Guha, R. 1982. On Some Aspect of Historiography of Colonial India. In Ranajit Guha. ed. *Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society*, Delhi: Oxford University Press.

Guha, R. 1996. Small Voices of History. In Shahid Amin and Dipesh Chakrabarty. eds., *Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society,* Delhi: Oxford University Press.

Hardiman, D. 1994. *Power in the forest: The Dangs, 1820-1940.* In David Arnold and David Hardeman. eds., *Subaltern Studies viii: Writings on South Asian History and Society,* Delhi: Oxford University Press.

Mani, L. 1998. *Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India.* University of California Press.

Thomas, N. 1996. *Colonialism's Culture: Anthropology Travel and Government.* Camdridge: Polity Press.

Rabinnow, P. 1991. *Foucault Reader.* London: Penguin groups

Said, E. 2001. *Orientalism.* Delhi: Penguin Books.

Visweswaran, K. 1996. Small Speeches, Subaltern Gender: Nationalist Ideology and its Historiography. In Shahid Amin and Dipesh Chakrabarty. eds., *Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society,* Delhi: Oxford University Press.

ভদ্র গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) (১৯৯৮), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রইভেট লিমিটেড।

মাহমুদুল সুমন (২০১১) সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে একটি মনোলোগ, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা ১৬, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়